শঙ্খ ঘোষ
ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতিকথা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১

শঙ্খ ঘোষের মতো ধৈর্যশীল শ্রোতা পেয়ে অল্প বয়েসে এতই বকবক করতাম যে সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত *Calcutta: A living City* গ্রন্থে তাঁর ''কলকাতার সাহিত্য জগৎ, ১৯৪১-১৯৮০'' নামাঙ্কিত প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি আমাকে প্রগলভ কলেজছাত্র আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ ছিল 'কবিতা-পরিচয়'-এর আত্মপ্রকাশ।

১৯৯০-এ লেখা সেই প্রবন্ধের একটা অংশ এই:

> a loquacious college student, Amarendra Chakravorty (1942) was moving between certain congenial houses spread across the city to set up an ideal forum for the discussion of modern poetry. Almost single-handedly, with the money saved from his allowance, he brought out an austerely-produced monthly in May 1966 with discussions of five poems. Uniting the title of two predecessors of opposite bents, it was called Kabita-Parichay. From the very second issue, an interest grew up around this magazine devoted to poems rather than poets. Writers like Ayub and Buddhadeb contributed unasked. Bishnu Dey commented in the August issue: "Our education system has virtually ensured that we neglect the poem in favour of the poet's life and philosophy. Hence an effort like this is specially valuable."

১৯৯০-এ প্রকাশিত এই লেখার অনেক আগে, ১৯৬৬-র বসন্তে, একদিন শঙ্খবাবুদের শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উলটো দিকের গলিতে তাঁদের বাসায় সারাবেলা নানা কথায় ডুবে-ভেসে, রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতা নিয়ে লেখাটা পেয়ে দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যও লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে চলে আসছি, উঠে দাঁড়াবার সময় চোখে পড়ল আমার বাঁহাতে ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দুর মতো ছোট্ট একটা ফোঁটা টলটল করছে। ভালো করে দেখে বললাম, আমার বোধহয় চিকেন পক্স হচ্ছে।

''আপনি সুস্থ আছেন কিনা আমি কী করে জানব?''

''যদি দু'সপ্তাহ না আসি তাহলে জানবেন বসন্ত আমাকে দয়া করেছে। 'কবিতা-পরিচয়'-এর শুরু হওয়া ওই দু'সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে।''

২

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' ও 'প্রশ্ন' কবিতা দুটি নিয়ে 'কবিতা-পরিচয়'-এ পর পর দু'সংখ্যায় দুটি আলোচনা পড়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রত্যালোচনা 'কবিতা-পরিচয়'-এর পরপরই দেশ-এও প্রকাশিত হচ্ছিল। সাগরময় ঘোষের অনুরোধে আমি এই ব্যবস্থায় সম্মতি জানাবার ফলে এটা ঘটছিল। দু'জনের উত্তর-প্রত্যুত্তরে দুটি পত্রিকা তখন বহুজনের মনোযোগের বিষয়। শেষ উত্তর ছাপা হল দেশ-এ আবু সয়ীদ আইয়ুবের। আমার এটা পছন্দ হল না। কেননা রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটি নিয়ে 'কবিতা-পরিচয়'-এ শঙ্খ ঘোষই প্রথম আলোচনা করেছেন, উত্তর-প্রত্যুত্তরও শেষ হওয়া উচিত তাঁরই বক্তব্যে। কিন্তু 'কবিতা-পরিচয়'-এ শঙ্খবাবুর শেষ উত্তরের পরও আইয়ুবের প্রত্যুত্তর ছাপা হল 'দেশ'-এ। শঙ্খবাবুকে বললাম, 'দেশ'-এও তাই আপনার উত্তরও প্রকাশিত হওয়া দরকার।

এ নিয়ে সাগরময়বাবুর সঙ্গে আমি কথা বলব শুনেই শঙ্খবাবু সামনে সাপ দেখার মতো বলে উঠলেন, 'না না, আপনি এটা নিয়ে ওঁকে কিছু বলবেন না।'

৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যার প্রতিবাদে গান্ধীভবনের পেছনে দূর মাঠের মধ্যে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নকশালদের পোস্টার পড়ল, যতদূর মনে পড়ে, এইরকম— ওই সভায় কেউ গেলে তাঁর ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দেওয়া হবে।

সভানুষ্ঠানের দিন নকশালদের হুমকি উপেক্ষা করে শঙ্খবাবুকে দেখা গেল সভাস্থলের দিকে একা হেঁটে চলেছেন। একটু পরেই ফিরেও এলেন একা, দেখলাম, তাঁর ধুতি মাঠের চোরকাঁটায় ভরে গেছে।

এদিকে যতদূর মনে পড়ে চতুরঙ্গ পত্রিকায় বা আর কোথাও শঙ্খবাবু লিখেছেন, কাঁধ থেকে ঘাড় পর্যন্ত টান টান পেশির তরুণেরা সুন্দর একটা দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে, ইত্যাদি।

আমি তখন যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাসের অনিয়মিত ছাত্র।

৪

১৯৭৫-৭৬ সালে, তখন একটা সুবিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের বইপত্র প্রকাশনা বিভাগের প্রধান হিসেবে চাকরি করি, একদিন এলিট সিনেমার সামনের এস এন ব্যানার্জি রোডে, রাস্তায় শঙ্খবাবুকে দেখে নেমে পড়ি। আমাকে হঠাৎই গাড়ি থেকে নামতে দেখে শঙ্খবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর কৌতূহলের উত্তরে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠি, ''সকাল ন'টায় বাড়িতে গাড়ি যায়, আবার রাত দশটা-এগারোটায় বাড়িতে নামায়। অফিসের কাজের শেষে যেসব প্রেসে ওই এডুকেশন সোসাইটির বই ছাপাবার কাজের ভার দিয়েছি, সেসব প্রেসে ভিজিট করতে হয়। তাদের কাজ আরও ভালো করে করার উপায় বাৎলাতে হয়। এই চাকরি শুরু করার পর থেকে আজ অব্দি এক লাইন কবিতাও আমি লিখতে পারিনি। এ চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি।''

''না, না। এখনই চাকরি ছাড়বেন না।'' বলে আমাকে নিরস্ত করার বোধহয় দু-তিন মাস পরই আমি নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না করেই ইস্তফা দিই।

শঙ্খবাবু তাঁর সারা জীবন ধরেই বহুজনের মতো আমার জীবনেও নানা প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। সবই তাঁর স্বভাববশে। চাকরি ছেড়ে কখনও নিজের তাগিদে লিখছি, কখনও খবরের কাগজের অ্যাসাইনমেন্টে লিখছি, তার ফাঁকে ফাঁকে আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, আজকাল-এ দুয়েকটা গল্প বেরচ্ছে। কোথায় কোন গল্পটা তাঁর বিশেষ রকম ভালো লেগেছে তিনি জানাতে ভোলেন না। আনন্দবাজারে ভয়, ধুলো, আর যুগান্তরে গৃহ, নিমফুলের মধু-ও বেরবার পর একদিন বললেন, গল্পগুলো নিয়ে একটা বই হওয়া দরকার। নাহলে পরে হয়তো কাগজগুলো হাতের কাছে খুঁজে পাবেন না, গল্পগুলো হারিয়ে যাবে।

মাঝেমাঝেই এমন শুনে, সঙ্গে আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বন্ধু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উশকানিতে, শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬-র এপ্রিলে ''নিমফুলের মধু'' প্রকাশের ব্যবস্থা হল। প্রফুল্ল রায় কিন্নর রায়কে দায়িত্ব দিলেন, কোনও শিল্পীকে দিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ করিয়ে আনতে। বইয়ের ভূমিকায় এ বই প্রকাশের দায় লিখিত ভাবেই শঙ্খ ঘোষ ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপালাম। এ বইটি উৎসর্গ করেছি ''শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ বন্ধু শ্রী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী প্রফুল্ল রায়কে— আমার মতো একে-অক্ষম-তায়-কুঁড়েকেও যাঁরা গল্প লিখিয়ে ছেড়েছেন।''

৫

নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে, বাংলার দলীয় রাজনীতি তখন পারস্পরিক কটূক্তিতেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, তার চেয়ে বেশি, রক্তমুখীও, সেই সময়টা প্রায়ই আমার রাত কাটত অনর্গল কবিতা লিখে। যেমন,

এ রক্ত কি ইতিহাস? আমাদেরই সমসাময়িক!
এ রক্ত আহুতি নয়, রক্তে ভিজে গেছে চারিদিক!
এ রক্ত সৃষ্টির নয়, শয়তানের ক্ষুধার্ত আহ্নিক,
এ রক্ত স্বপ্নের নয়, এক-দুই-ত্রিধারাবাহিক।

কিংবা,

একদিন ভোরে দেখি পাখিদের মেলা বসে গেছে।
এমনিতে এই বনে নিহতের দেহ কারা ফেলে চলে যায়—
জ্যোৎস্নাহত এই তো সেদিন পথভোলা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা
সাতটি শবদেহ দেখে কণ্ঠরোধে ভুগছে এখন,
সাত ছেলে পাশাপাশি, দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা
ভোট কবে শেষ হবে নিহত বা পাখিরা তার কিছুই জানে না।

সেইসব কবিতা যখন যে পত্রিকা চেয়েছে তখনই তাকে বেশ কয়েকটা দিই। একদিন ঢাকা-কলকাতার সেতুবাঁধা কবি, আমার বন্ধু বেলাল চৌধুরী আমাদের বাড়িতে সারারাত সেইসব কবিতা পড়ে শেষ রাতে বলল, ''আজকালের মধ্যেই এগুলো বই করে ফেলো।'' সকালে ঘুম থেকে উঠেও একই কথা। বেলাল এমনিতেও খুবই বন্ধুবৎসল। তাছাড়া, আমার অন্যান্য কাজেরও অনুরাগী, ঢাকার খবরের কাগজে সে আমার কথা একটু বেশিই ফলাও করে লিখেছে। তাই তার কথায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আমি সেদিনই সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘোষকে সব ক'টি কবিতার কম্পিউটার প্রিন্ট পড়তে দিলাম। পাঁচ-ছটা কবিতা পড়ার পর, তাঁর চোখের কোনও অসুবিধা অনুমান করে বললাম, ''আমি কি পড়ে দেব?''

''দিন।''

যে পর্যন্ত পড়েছিলেন, সেখানে আঙুল রেখে পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে দিলেন। সেখান থেকে বাকি সব ক'টি কবিতা কোনও বিরতি ছাড়াই পড়ে বললাম, ''এগুলো কবিতা হয়েছে কিনা জানি না। যা যেমন মনে এসেছে অনর্গল লিখে গেছি।''

শঙ্খবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, ''কবিতা তো তাই।''

৬

আমাকে লেখা নানা জনের বেশ কিছু চিঠি হারিয়ে যাবার পরও অনেক দিনের অনেক চিঠি জমে ছিল আমার পুরনো কাগজপত্রের স্তূপে। একদিন আমার অন্তরের আমন্ত্রণে শঙ্খ ঘোষ এসেছিলেন আমার কয়েকটি নতুন পেইন্টিং দেখতে। ছবি দেখা ও কথালাপের শেষে চলে যাওয়ার মুখে সেই চিঠিগুলির কথা তুলি। এগুলি ছাপা উচিত কিনা বা আমার ছাপার অধিকার আছে কিনা, সে বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাই।

তাঁর উত্তর: ''আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে দেখে বলতে পারব।''

পরদিন সব চিঠিই তাঁর বাড়িতে পাঠাই। দু'তিন দিনের মধ্যে তাঁর ফোন পাই। কথাগুলো মনে আছে— ''এত দিন না ছেপে ফেলে রেখেছিলেন?''

তারপরই 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এই সব চিঠি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। নাম দিই 'বটের ঝুরি'।

৭

একটা সময় যখন অস্বাভাবিক কাজের চাপে শঙ্খবাবুর বাড়িতে যাওয়ার সময়ের টানাটানি তখন কি আমাদের কথা বন্ধ থাকত? একেবারেই না। তখন রাত সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ ফোন করতাম। কথা চলত কখনও কখনও এক-দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। আধঘণ্টার কমে কখনও নয়। সে-ই ছিল আমার সারা দিনের শেষে মানসসরোবর পরিক্রমা।

একদিন উনিই ফোন করে বললেন, ''দূরদর্শনে আপনার 'সঙ্গে ভ্রমণ' রিপিট প্রোগ্রামের সময়টা শনিবার রাত এগারোটা থেকে রবিবার দুপুর হয়ে গেল! আর তো আমার দেখা হবে না। শনিবার রাতেই আমি দেখতাম। খুব ভালো লাগত।''

তখন ওয়ার্ল্ড নিউজপেপার্স কংগ্রেস বা ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের আমন্ত্রণে যখন যে দেশেই যেতাম সঙ্গে একটা ছোট হ্যান্ডিক্যাম থাকত, সম্মেলনের আগে-পরে সে দেশের ওপর ছবি তুলতাম। শুধু ছবি তৈরির জন্যও গেছি কোথাও কোথাও। যেমন আন্টার্কটিকায় বা আলাস্কায়।

আমার নানা দেশ ঘুরে তোলা সেই ভ্রমণচিত্রগুলি ডিডি বাংলায় দেখানো হত। মঙ্গলবার সন্ধেয় ও তার পুনঃপ্রচার শনিবার রাত এগারোটায়।

মঙ্গলবার সন্ধের অনুষ্ঠান দেখার তাঁর সুযোগ হত না বলে তিনি দেখতেন শনিবার রাতেরটা।

আমার এই দেশ-দেশান্তরের ছবি দেখেই তিনি লিখেছেন, ''নিজে যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত কিংবা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দুর্গতম অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে।''

এরকমই একবার দমদম থেকে রাত দুটোর ফ্লাইটে বিদেশ যাবার পথে এগারোটায় শঙ্খবাবুর কাছে আধঘণ্টার জন্য যেতে পারি জেনে রাত দশটায় বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে গৃহকর্ত্রী বললেন, ওঁর কাছে এত রাতে যাওয়া বোধহয় ঠিক না। শঙ্খবাবুকে ফোন করে জানলাম, উনি ভেবেছিলেন বেলা ১১টায় আসব। তাই উনি রাজি হয়েছিলেন।

অনেক কাল আগে একবার শুধু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদচিত্র ও তার বিস্তারিত ক্যাপশান দিয়েই একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা করার পরিকল্পনা মাথায় চাপল। তার নামও ভেবে ফেলেছিলাম— 'কালচিত্র'। কল্পনার তো অভাব নেই, অভাব শুধু টাকার। একদিন মালায়লম পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার সিনিয়র ম্যাথু (মামন ম্যাথুর পিতা) তাঁদের দিল্লির বাড়িতে অমৃতবাজার পত্রিকা ও আজকাল পত্রিকার প্রকাশক প্রতাপকুমার রায়ের সঙ্গে আমাকেও নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ভোজের আসরে আমার 'কালচিত্র'র পরিকল্পনা শুনে ম্যাথু বললেন, আমি আছি আপনার সঙ্গে। আপনার পত্রিকাটা একযোগে কলকাতা ও কোট্টায়াম থেকে বেরবে। ক্যাপশন বাংলা, মালয়ালম দু'ভাষাতেই থাকবে। 'দ্য হিন্দু'র জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন মুরলীও শুনে আগ্রহ দেখালেন। ঠিক হল বিষয়টা নিয়ে আমি, প্রতাপকুমার রায়, ম্যাথু ও মুরলী একসঙ্গে বসে বিশদে আলোচনা করব। ভেনু, কলকাতা বা কোট্টায়াম

বা চেন্নাই! শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে ঠিক হল 'মস্কো'।

আমাকে কলকাতায় ফিরেই কাশ্মীর যেতে হল। এদিকে মিসেস রুবি রায়ের পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়েছে। রিনিউ করার দরকার। তখন পাসপোর্টের ব্যাপারে শেষমেষ লর্ড সিনহা রোডের পুলিশী ছাড়পত্র লাগত। সেখানকার কোনও কর্তাব্যক্তিকে আমি ফোনে কাজটার গুরুত্ব বুঝিয়ে ঠিক সময়ে পাসপোর্টটা রিনিউ করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে কাশ্মীর চলে গেলাম।

কাশ্মীর থেকে ফিরে আমাদের স্যুটকেসে আরও কিছু বাড়তি গরমের পোশাক নিয়ে মস্কো যাবার তোড়জোর করছি, প্রতাপবাবু বললেন, ''আমাদের যাওয়া হবে না। রুবির পাসপোর্ট আসেনি।''

লর্ড সিনহা রোডের কর্তাকে নালিশ জানিয়ে শুনলাম, আপনার দেওয়া নির্দিষ্ট তারিখের আগেই তো পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৯/১, বালিগঞ্জ প্লেসের ঠিকানায় রুবি রায়ের নামেই।

রুবি রায় নামে আরও একজন আছেন কে জানত! ঠিকানাও প্রায় এক। প্রতাপবাবুদের ২৯/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বদলে দ্বিতীয় রুবি রায়ের ঠিকানা ২৯/১, বালিগঞ্জ প্লেস।

অতএব সেবার মস্কো যাওয়া হল না। ম্যাথু ও মুরলীর টিকিট, ভিসা, হোটেল আগেই ঠিক হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আমাদের ছাড়াই যেতে বাধ্য হলেন। যে উদ্দেশ্যে যাওয়া তা পণ্ড হল।

এরপরই যেদিন শঙ্খবাবুর বাড়ি গেলাম, উনি জিজ্ঞেস করলেন, মস্কোর অবস্থা কেমন দেখলেন?

সেটা বোধহয় ১৯৮৭ সাল। গর্বাচভ তখনও অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

''যাওয়া হল না'' শুনেই শঙ্খবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, এখন ওরা আর বিদেশিদের যেতে দিচ্ছে না।''

আমাদের কেউ বাধা দেয়নি, আমাদের একজনের পাসপোর্ট রিনিউ না হওয়ায় আমাদের যাওয়া হয়নি। পরের বছরই আমরা তখনকার অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় পুরোটাই ঘুরে এসেছি। মে ডে-তে মস্কোয় রেড স্কোয়্যারে গর্বাচভের রুশ ভাষার ভাষণও শুনেছি। কিন্তু শঙ্খবাবুর ভুল ধারণা আর ভাঙা হয়নি।

আরেকবার যুগোস্লাভিয়ায় যাচ্ছি শুনে শঙ্খবাবু বললেন, ''ওদেশে মার্ট ওগেনের কোনও খবর পান কিনা দেখবেন তো একটু। অনেককাল ওর কোনও খবর পাইনি।''

অখণ্ড যুগোস্লাভিয়ার কবি মার্ট ওগেন-এর কথা আছে তাঁর 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'-এ।

যুগোস্লাভিয়ায় যাঁর আমন্ত্রণে যাবার কথা, তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন, প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজধানী বেলগ্রেড এখন অগ্নিগর্ভ। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। এই অবস্থায় বিদেশি কোনও অতিথির পক্ষে দেশটা বিপজ্জনক। ফলে সে যাত্রা আমার যাওয়াই হল না। তবু নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমার অনুরোধে মার্ট ওগেনকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে জানালেন, আমাদের দেশ এখন ভাগ হয়ে গেছে, ওগেন এখন অন্য দেশের। তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আমার আর কোনও উপায় নেই।

৮

শঙ্খবাবুর সঙ্গে সেদিন কী বিষয়ে যেন কথা হচ্ছিল। আমিই বেশি বলছিলাম, উনি শুনছিলেন বেশি, স্বভাব মতো কথা বলছিলেন দুয়েক শব্দে। ওঁর ছোট মেয়ে টিয়া, ঘরে এসে বিদ্যাসাগরের জন্মের দুশো বছর উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় ওঁকে লিখতে বলায় ওঁর উত্তর, পারব না। টিয়াও নাছোড়। নানা যুক্তিতে কেবলই শঙ্খবাবুকে চাপ দিতে থাকল। সব যুক্তির এক উত্তর, হবে না। শেষমেশ টিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র: তুমি না লিখলে এ বিষয়ে লেখবার আর কেউ নেই।

এবারও সেই 'পারব না'। টিয়া তখন নিরুপায় হয়ে বলল, বেশ, তোমার একটা সাক্ষাৎকার নেবার ব্যবস্থা করি, সেই ফরম্যাটে তুমি তাঁর জন্মের দুশো বছর নিয়ে তোমার বিদ্যাসাগর ভাবনা ব'লো।

এবার ওঁর 'না' বলার সঙ্গেই আমিও বলে উঠলাম, না না, সেটা ঠিক হবে না।

আগেও দেখেছি, সেদিনও দেখলাম, কোনো বিষয়ে, লেখাই হোক আর বলাই হোক, শঙ্খবাবুর অসম্মতিকে সম্মতিতে বদলে দেবার শক্তি মানুষ তো ছাড়, ভগবানেরও নেই।

শেষ পর্যন্ত আনন্দবাজারে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে শঙ্খবাবুকে লেখানোর গুরুদায়িত্ব

টিয়া, আনন্দবাজারে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার গুরুভারবাহী সেমন্তী ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকায় যার অধিকাংশ লেখারই আমি মুগ্ধ পাঠক, কীভাবে সামলেছিল আমার দেখা হয়নি। তখন বোধহয় দেশে ছিলাম না।

টিয়াকে প্রথম দেখি শঙ্খবাবুদের বাড়িতে, শঙ্খবাবুই কোলে করে এনে সুন্দর কাঁথায় জড়ানো তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে বলেছিলেন, আমাদের পরিবারের নতুন সদস্য। বয়স ছ'দিন।

৯

কয়েক বছর আগের কথা। প্রতিমাদি তখন চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না। শঙ্খবাবুর এ ঘরে আসতে একটু দেরি, তবু একা বসে আছি দেখে অনেকদিন পর প্রতিমাদি নিজেই এসে বসলেন। ইলেক্ট্রিক চশমা বা ক্যামেরা চোখের সামনে ধরে কাগজের একটা হেডিং পড়ে আমাকে শুনিয়ে মুখময় হাসি। শঙ্খবাবু এসেছেন দেখে তাঁর দায়িত্ব শেষ। আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

আমি বললাম, ''অনেক দিন পর প্রতিমাদিকে দেখলাম, এখনও কী সুন্দর! ইনি কি কোনও রাজপরিবারের মেয়ে?''

মৃদু হেসে শঙ্খবাবুর উত্তর— ''না, ঠিক রাজপরিবারের না। তবে আমাদের বিয়ের দিন একটি কিশোরী এই বলে কেঁদে কেটে শহর মাথায় করেছিল যে, জলপাইগুড়ির শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সঙ্গে এক কালো কুৎসিত মানুষের বিয়ে হচ্ছে। সেই কিশোরীর নাম কাকলি। তখনো দেবেশের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি।''

আমার হো হো হাসির পালা শেষ হলে শঙ্খবাবুর সঙ্গে আমার কিশোরসাহিত্য সমগ্রর কটা খণ্ড হওয়া উচিত তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর যখন উঠতে যাচ্ছি, তখন শঙ্খবাবু বললেন, ''আপনার খুব তাড়া না থাকলে একটু বসে যান, দেবেশও আসছে।''

দেবেশবাবু কানে শোনেন না। বিষয়টা একবার ধরিয়ে দিতে গলা খুলে সেদিন কাকলির ট্যাঁড়া পেটানোর বিশদ বিবরণ দিলেন।

১০

২০১৪ সালে একবার সুমন মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক সেনের একই দিনে দুটি নাটকের অভিনয়ের শেষ দিকে এক মঞ্চে হঠাৎ আগুন লাগায় সুমন তাঁর 'যারা আগুন লাগায়' নাটকের শেষে দর্শকদের উদ্দেশে তাঁদের নাটকের হল পাওয়ার সমস্যার কথা জানালেন। নাটক দেখে মঞ্চে আগুন লাগা সম্পর্কে 'কালের কষ্টিপাথর'-এ সে মাসের সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে স্মৃতি থেকে পার্ক সার্কাস থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মিনিবাসে পাশাপাশি বসে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে অনেকদিন আগের এক নাতিদীর্ঘ কথালাপের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। শম্ভু মিত্রের মুখের কথা ঠিক ঠিক লেখা হল কিনা জানতে শঙ্খবাবুকে ফোন করে বললাম, ''ছোট্ট একটা লেখা পড়ে শোনাব। আপনি কি এখন পাঁচ মিনিট শুনতে পারবেন?''

''পাঁচ মিনিট? বলুন। শুনছি।''

পুরো লেখাটা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, ''শম্ভু মিত্রের মুখের কথা নির্ভুল লেখা হয়েছে কি?''

''হ্যাঁ, ওঁর মুখের কথাই আপনি লিখেছেন।'' স্বভাব-স্নেহশীল স্বরে কথাটা বলে অপ্রসন্ন স্বরে কথাটা শেষ করলেন, ''কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিটের কথা বলে প্রায় দশ মিনিট নিলেন! আমার কাছে এসেছেন একজন, তাঁর কাছ থেকে উঠে এসে আপনার ফোন ধরেছি।''

১১

একবার, বোধহয় ২০১৩ সালে ঘন ঘন বিদেশে যেতে হয়েছিল। শঙ্খবাবুর কাছে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। বুলগেরিয়ার পর্যটন মন্ত্রকের আমন্ত্রণে পাঁচদিনে প্রায় পুরো দেশ ঘুরে, কলকাতায় ফিরেই গিয়েছিলাম রোয়ান্ডায় জঙ্গলে পাহাড়ি গোরিলাদের নিয়ে ছবি বানাতে। সেখান থেকে ফিরে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কী একটা শিশুসাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে যেতে হল দক্ষিণ কোরিয়ার সোলে। সকাল থেকে সন্ধে পর পর কয়েকটি অধিবেশন চালনা করে হোটেলে ফিরেই ফোন খুলে ইন্টারনেটে দেখি কলকাতার রাজপথে দীর্ঘ এক মিছিলে হনহন করে হেঁটে চলেছেন শঙ্খ ঘোষ।

কলকাতায় ফিরেই সোজা শঙ্খবাবুর কাছে। বললাম, ''সোলে বসে আপনার মিছিলে হাঁটা দেখে দাঙ্গার সময় গান্ধিজীর হাঁটার কথা মনে পড়ছিল।

''হাঁটব ভাবিনি। মিছিল রওনা হতে দেখে চলে আসব ভেবেছিলাম। পারলাম না। সোলে এই মিছিল দেখা গেল?''

''সোলের হোটেলে ইন্টারনেটে দেখলাম।''

আরেকদিনের কথা। রাজস্থানে মরুভূমিতে পরমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোয় দায়ী প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত থেকে নিতে হবে বলে সে বছরের সরস্বতী সম্মান নিলেন না শুনে বললাম, ''সরস্বতী সম্মান নিলেন না, পুরস্কারের টাকাটা আপনার নীতি মতো কোনও সংস্থাকে দান করার সুযোগও থাকল না তাহলে।''

''পুরস্কার নিইনি কথাটা ভুল। ঠিক এটুকুই, বাজপেয়ীর হাত থেকে নিইনি।''

২০১৬য় ইতালিতে কাচের জ্বলন্ত ঘোড়ার মুখ ধরে আমার লেন্সের দিকে ফেরাতে গিয়ে তিন আঙুল পুড়ে যাওয়ায় ফ্লোরেন্সের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। কিছুদিন পরই বোধহয় উলানবাতারে পড়ে গিয়ে ডান হাঁটু জখম করে মাঝরাতে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। প্রসঙ্গ দুটি তুলে শঙ্খবাবু জানতে চাইলেন, ''পোড়া আঙুল ও ভাঙা হাঁটু এখন কি পুরোই ঠিক হয়ে গেছে?''

আমি তো অবাক। উনি এসব জানলেন কী করে? শঙ্খবাবু মিটিমিটি হাসি মুখে বললেন, ''মহাশ্বেতার কাছে সব শুনেছি। আপনার ইয়ুংফ্রাওয়ের গ্লেসিয়ারে, পড়ে হাঁটু ফুলে যাওয়ার ঘটনাও শুনলাম। মহাশ্বেতা যখন আপনার এইসব দুর্ঘটনা বলছিল তখন ওর চোখেমুখে কিন্তু ভয় বা উদ্বেগ না, বরং একটা চাপা গর্বের ভাব দেখেছি।''

১২

একদিন তাঁর বইঠাসা ঘরে বসে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে। ওরই মধ্যে একবার কাগজে কয়েকটি সংখ্যা লিখে তারপর আরেক সারি সংখ্যা আমাকে লিখতে দিলেন। লিখলাম। এবার তাঁর পালা। তারপর আবার আমাকে লিখতে বললেন। প্রতিবারই আমার সংখ্যাগুলোর যোগফল বিজোড় সংখ্যা হবে সেকথা আগেই তিনি বলে দিচ্ছিলেন। এই ভাবে একটা মজার খেলায় আমার মেতে উঠেছিলাম।

একসময় কী ভাবতে ভাবতে বললেন, ''আমাদের যৌবনে পুজোসংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কবিতা পড়ে ভাবতাম, এঁরা এগুলো আর লেখেন কেন, ছাপাই বা হয় কেন? এখনকার পুজোসংখ্যাগুলোয় আমার কবিতা পড়েও হয়তো কেউ এমনই ভাবছেন।''

গত বছরও পুজোসংখ্যায় যিনি লিখলেন 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি', যাঁর কবিতা এখনই ফেসবুকের দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে, ঘুরছে পাঠকের মুখে মুখে, সেই কবির মুখে এই আত্মসমীক্ষা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

মনে পড়ল, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেও এক জনশূন্য ঝিপঝিপে বৃষ্টির রাত দশটায় তখনকার এসপ্ল্যানেড ট্রামগুমটির সামনেই পত্রিকাস্টলে নতুন লিটল্ ম্যাগাজিন ঘাঁটছি, হঠাৎ দেখলাম, অদূরে একলা একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো বাড়ি ফেরার বাস-ট্রামের জন্য। ভালো করে দেখি, সেই একলা মানুষটি শঙ্খ ঘোষ। আমার মনে তখন ক'দিন আগেই কোনো পত্রিকায় পড়া তাঁর একটা কবিতা ঝড় তুলেছে।

> আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে যাবার সময় আমি বলে যাব:/এতো দম্ভ ক'রো না পৃথিবী/ রয়ে গেল ঘরের কাঠামো/ঝাপটা ঝাপসা করে চোখ/হাহাকার উঠেছে তা হোক/ রয়ে গেল মাটির প্রতিভা/ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।

তাঁকে সামনে পেয়ে কবিতাটা নিয়ে আমার আবেগ উচ্ছ্বাস বিশদ না করে পারলাম না। স্বভাবত নীরব শ্রোতা সবটা শুনে বললেন, আপনি বললেন, ভালো হল। কবিতাটা লেখার পর থেকেই আমার মনে একটা অস্থিরতা চলছে। মনে হচ্ছে লেখাটার কোথাও কোনো গোলমাল হয়ে রয়েছে।

পাঁচ-ছ'দশক পরও, গত পরশু, এই ছাব্বিশে জুলাইও নিজের নতুন কবিতা নিয়ে তাঁর অহেতুক আত্মসমালোচনা শুনে ভাবি সেদিনের একান্ত আড্ডা শুধু 'ভালো'ই না, মানুষের দুর্লভ আন্তর ঐশ্বর্যের চিরকাঙাল এ আমার মণিমুক্তো সংগ্রহও।

এই তো সেদিনের কথা। প্রণম্য কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের ঘরে বসে আমার নতুন ছবি দেখছেন। আগে দু'বারই আমার চিত্রপ্রদর্শনীতে এসেছেন। আমার অন্তরের আমন্ত্রণে আমাদের বড়ি এসেও ছবি দেখেছেন। দীর্ঘকাল তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। এবার তাই তাঁর বাড়ি গিয়ে আমার কয়েকটি নতুন ছবি দেখাতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম কয়েক মাস আগে। গত সপ্তাহে ঠিক হল, আজ ১১ মার্চ, ২০২১ সন্ধে ছ'টায় যাব। সঙ্গে আমাদের ডালিম বড় বড় তিনটে ছবি অনায়াসে কাঁধে নিয়ে উঠে গেল

শঙ্খবাবুদের তিন তলার ফ্ল্যাটে। অত্যন্ত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও গভীর আগ্রহে, মন দিয়ে ছবি দেখছেন দেখে অবাক হইনি। কেননা এটাই তাঁর স্বভাব। ভয়ানক অবাক হয়েছি, চলে আসার সময় তাঁর বরাবরের অভ্যাস মতো জোর করে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসায়। আমি কেন, কারো বারণই শুনলেন না। যাঁকে ধরে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিতে হয়, তিনি তাঁর এই সৌজন্য ধরে রাখতে এতটাই দৃঢ়সংকল্প যে দরজা পর্যন্ত একা হাঁটা থেকে তাঁকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না!

অসীম এই শঙ্খসৈকতের একটি বালুকণাও আমরা হতে পারলাম না কেন? যদি পারতাম, তাহলে আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলির চেহারা দেখে উদ্বেগে দুরাশায় এমন হিম হয়ে থাকতে হত না।

১৩

শঙ্খবাবু আমাকে একদিন হঠাৎই ফোনে বললেন আর কিছুই লিখতে পারবেন না।

সে কী! কিছুই লিখতে পারবেন না মানে? কেন ভাবছেন এমন? কারণ জানতে চেয়ে আমি যেটাই উল্লেখ করি, তাঁর একটাই উত্তর, না, সে জন্য না।

কোনও বন্ধুর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন? না।

প্রকাশকের কাছ থেকে? না।

ভাইদের কাছ থেকে? না।

মিঠির কাছ থেকে? না।

টিয়ার কাছ থেকে? না। আমি আর কিছুই লিখতে পারব না।

শেষে তাঁর ভাই নিত্যপ্রিয় ঘোষকে বিষয়টা বলতে জানা গেল, কয়েক দিন আগে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠায় উনি ভেবেছিলেন, ক্যানসার। তাতেই হয়তো বিষণ্ণ হয়ে ভেবেছিলেন আর লিখতে পারবেন না।

১৪

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির লিটিল ম্যাগাজিন মেলা ও উৎসবে অভীক মজুমদার পরিকল্পিত 'পাঁচটি তারার তিমির' প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হবারও আগে আমি আনন্দে আত্মহারা। এটা জেনে যে, গত কাল, দীর্ঘদিন অসুস্থ তবু জরাজয়ী শঙ্খ ঘোষ হুইল চেয়ার থেকে মনের জোরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ে হেঁটে এই প্রদর্শনী দেখেছেন। বিস্ময়ের তখনও বাকি। সেদিনই বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই স্বপ্নের টেলিফোন! ফোনের ওপ্রান্তে স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ। কথা বলবেন আমার সঙ্গে।

ওঁর সুদীর্ঘ অসুখে ফোন ধরতে যদি কষ্ট হয় ভেবে আমি নিজে অনেক কাল ফোন করা থেকে বিরত ছিলাম।

কতদিন পর তাঁর নিজের গলা শুনলাম। বললেন, ''কিছুক্ষণ পর আমার কথা আর বোঝা না গেলেও আপনি কথা বলে যাবেন, স্নেহাশিস স্পিকারে আছে, আমার জড়ানো কথা ওই আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।''

আমাকে চুপ করে থাকতে শুনে এবার আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, ''ভূমিকা কবে পেলে আপনাদের কাজ হবে?''

''ভূমিকা? কোন ভূমিকা?''

''আপনার শিশু-কিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকা।''

''ওহ্, আপনি লিখতে পারবেন?''

''কবে হলে আপনাদের কাজে লাগবে?''

''ফেব্রুয়ারিতে।''

''এটাই তো ফেব্রুয়ারি।''

''ও, তবে মার্চে।''

''মার্চে হবে না।''

''তাহলে এপ্রিলে।''

''আরও একটু দেরি হবে।''

''মে-তে?''

''মে মাসে পাবেন।''

''মে-র গোড়ায় পেলে ও-মাসের মাঝামাঝি বই বেরতে পারবে।''

''মে-র প্রথম দিকে লিখব।''

মে মাস পড়বার কিছু আগে ২১ এপ্রিল সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেলেন অমরতার দেশে।

আমার শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকা নিয়ে এই কথোপকথনেরও ছোট একটা ইতিহাস আছে।

শিশুসাহিত্য সংসদের কর্ণধার ও আমার বন্ধু দেবজ্যোতি দত্ত কয়েকদিনই অফিস ফেরত আমাদের বাড়িতে এসে ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁর একটা দীর্ঘকালীন ক্ষোভের কথা বিবৃত করতেন। ''শাদা ঘোড়া, হীরু ডাকাত, ঋষিকুমার, গৌরযাযাবর একেকটা বই বেরয় আর ভাবি এ সবই তো আমাদের শিশুসাহিত্য সংসদের বই হতে পারত। বই প্রকাশনা তো তোমার কাজ না, এবার এগুলো আমাদের দাও।''

সত্যিই তো, বই প্রকাশের আমি তো কিছুই জানি না। দুই বাংলায় দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নতুন একটা লেখা 'চাঁদের তাঁবু' দেবজ্যোতিকে দিলাম। একরকম জোর করেই দেবজ্যোতি এর সঙ্গে শারদীয় দোয়েল-এ আমার সদ্য প্রকাশিত 'দুরুদুরু' গল্পটাও নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দুটি বই-ই শিশুসাহিত্য সংসদ একই সময়ে প্রকাশ করল।

তখন আমার 'শিশু-কিশোর সাহিত্য সমগ্র'র পরিকল্পনা চলছে। দুখণ্ডে আমার সব ছোটদের বই বের করার কথা ভাবছি। শঙ্খ ঘোষের কাছে সব ক'টা বইয়ের কম্পিউটার প্রিন্ট পাঠানো হল। ফোন করে অনুরোধ করলাম, যদি এই সমগ্রের ব্যাপারে তাঁর মত জানান। কথামতো সপ্তাহখানেক পর তাঁর কাছে গেলাম। দেখি সামনে সেই কম্পিউটার প্রিন্টের বোঝা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ''দুখণ্ডে হবে না, চার খণ্ডে হলে ভালো হয়, অন্তত তিন খণ্ডে।''

শিশু ও কিশোর সাহিত্য সমগ্রের কোন খণ্ডে কোন কোন লেখা থাকা উচিত তা নিয়েও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। একদিন সেই আলোচনার শেষে আমাদের ছাদবাগানে নতুন গাছপালা লতাগুল্ম সম্পর্কে শুনতে শুনতে বললেন, ''বাঁশগাছের পাতায় চৈত্রের হাওয়ায় ঝিরিঝিরি শোনা যাচ্ছে এখন?''

আগের বার এক শরতে বড় টবে অনেকগুলো বাঁশগাছ দেখিয়ে বলেছিলাম, চৈত্র মাসে এখানে বাঁশগাছের পাতায় ঝিরিঝিরি শোনা যাবে। সে কথা মনে রেখে তাঁর এই প্রশ্ন।

শঙ্খবাবুর উপদেশ শিরোধার্য করে আমার শিশু ও কিশোর সাহিত্য দুখণ্ডের বদলে, তখন তিন খণ্ডে করার কথা ভাবা হচ্ছে।

দেবজ্যোতি বললেন, ''এই সমগ্র আমাদের দাও। আর শঙ্খবাবুকে দিয়ে এর ভূমিকা লেখাও।''

''ভূমিকা লেখার কথা ওঁকে আমি বলতেই পারব না।''

''আগেও আমি ওঁদের বাড়ি গেছি। তবু এবার তোমার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলো। ভূমিকা লেখার কথা আমিই বলব।''

দেবজ্যোতির মুখে সবটা শুনে শঙ্খবাবুর উত্তর, ''অমরেন্দ্রর এত ভালো ভালো সব লেখার সঙ্গে আমার একটা ছোট ভূমিকা কি মানাবে?''

দেবজ্যোতির তৎক্ষণাৎ উত্তর, ''আপনি আট লাইন লিখলেও তার গুরুত্ব অপরিসীম।''

''এই তো, এভাবে বললে আমি লিখতে পারব না।''

বাড়ি ফিরে এসে মনে হল, আমাদের সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে শঙ্খ ঘোষের মতো এক আকাশস্পর্শী ব্যক্তিত্বের ভূমিকা-সহ আমার এই বই বেরলে সবাই ভাববে, আমি এখন শঙ্খ ঘোষের সাহায্য নিয়ে আমার লেখাগুলোকে দাঁড় করাতে চাইছি। এও মনে হল, এই ভূমিকা লেখায় ওঁর একটু হলেও অনিচ্ছা আছে। অনেকদিন আগে আমাকে একবার বলেছিলেন, কবিতা বা তাঁর কিশোর-সাহিত্য ছাড়া কোনও গদ্যই তিনি অন্যের নিরন্তর তাগাদা ছাড়া লেখেননি। সেদিন কথাটা উঠেছিল বিশেষ করে এই ঘটনায় যে, আজকাল-এ ছোটদের পাতায় ধারাবাহিক 'হীরু ডাকাত' শেষ হওয়ার পরই শঙ্খবাবু ছোটদের পাতার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি নন্দীকে নিজে থেকেই জানিয়েছিলেন, 'হীরু ডাকাত' নিয়ে তিনি লিখবেন। কথাটা শুনে ধ্রুবজ্যোতি এতই আহ্লাদে আটখানা হয়ে যান যে ছ-আট মাস অপেক্ষার পরও লেখা না পেয়ে হতাশ। ধ্রুবজ্যোতির কাছে শুনে এটা আমি শঙ্খবাবুকে বলতেই তিনি বলেন, ''ধ্রুবজ্যোতির দোষ নেই, ও তো আর জানত না যে নাছোড় তাগাদা ছাড়া আমি গদ্য লিখতেই পারি না।''

এইসব ভেবে আমি শঙ্খবাবুকে এই চিঠি লিখি:

শ্রী শঙ্খ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমাদের ছাদে এখন গ্রামবাংলা দেখবার কথায় আঠেরোটা সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে হবে, পারবেন কি না শুনে আপনি মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে, স্বভাবত সংক্ষিপ্ততম বাক্যে যেই বললেন, 'কেন পারব না!' আমার তখন খুব ভালো লাগল। এই ভালো লাগারও নানা মাত্রা। বড় ভরসা জোগায়।

পরশু আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে হঠাৎ একটা কথা মনে হল, যা শুনে আপনার তো ভালো লাগবেই। কথাটা হল, শিশুসাহিত্য সমগ্রই হোক আর কিশোরসাহিত্য সমগ্র, বইয়ের শুরুতে কারও ভূমিকা থাকা কি ঠিক? মনে হল, ঠিক না। কেননা আপনাকে যদি শত অনুরোধে শেষ অব্দি বই দুটোর ভূমিকা লিখতে রাজি করাও যায়, সবাই ভাববে, লেখাগুলো নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে না বলে শঙ্খ ঘোষের মতো এক আলোকস্তম্ভের ভূমিকার জোরে এইসব লেখার মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন শ্রীলংকা যাচ্ছি। এবার জাফনায়। ক'দিন ধরে দেখব। ছবি তৈরি করব। এমাসের শেষে ফিরে এসে আপনাকে ফোন করব। আপনার সুবিধে মতো ছাদের বনাঞ্চল দেখার দিন নির্ধারণ জানব। নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে হলে ছাদের জঙ্গলের পক্ষে ভালো।

এয়ারপোর্ট থেকেই এই চিঠি পাঠাচ্ছি। আমাদের গাড়ির চালক প্রকাশ পৌঁছে দেবে।

প্রণাম।
অমরেন্দ্র
২০/১০/২০১৯

এই চিঠি লেখার অনেকদিন পর মনে হল, শঙ্খবাবু নিজের কিশোরবেলার স্মৃতিনির্ভর 'সকালবেলার আলো' ও 'সুপুরিবনের সারি' দুটি গদ্য আখ্যান লিখলেও, কিংবা ছোটদের জন্য অসংখ্য আশ্চর্য ছন্দমিলের কবিতা, তাঁর শিশু বা কিশোর সাহিত্য ভাবনা কখনও আমাদের জানা হয়নি। তাই আমার শিশুকিশোর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকা লিখতে গিয়ে হয়তো শিশুসাহিত্যের নতুন কোনও মাত্রা বা তার সমকালীন তাৎপর্য চেনাতে পারবেন আমাদের।

এইসব ভেবে একদিন হঠাৎই শঙ্খবাবুকে ফোন করি। ফোন ধরলেন স্নেহাশিস পাত্র। তাঁকে বললাম, অনেক কাল আগে অমুক বিষয়ে আমি শঙ্খবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আপনি কি তা জানেন?

''সেটা তো আমিই স্যারকে পড়িয়ে জায়গা মতো রেখে দিয়েছি।''

''সেটা এখন বের করে কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলুন।''

''স্যার না বললে তো আমি কোনও চিঠিই ছিড়তে পারি না।''

''স্যারকে আমার নাম করে বলুন যে আমিই এটা ছিড়ে ফেলতে বলেছি।''

এই ঘটনার বেশ কয়েক মাস পর সেই ২০২১-এর ৮ ফেব্রুয়ারির সন্ধের ফোন।

১৫

১২ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে শঙ্খ বাবুর ফোন। আমাকে নিয়ে ওঁর লেখাটা আমি পড়েছি কি না জানতে এই ফোন। ঠিক তখনই মহাশ্বেতার ফরওয়ার্ড করা ই-মেল পেয়ে হাতের ফোনেই তাঁর 'নানা অমরেন্দ্র' নামের লেখাটা পড়তে শুরু করেছি। সেটা জানাতেই বললেন, ''কোথাও কোনো ভুল দেখলে বলবেন,শুধরে দেব।''

ভুল কী দেখব, পড়ে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, নাকি আকাশে উঠে গেলাম, জানি না। আমার কবেকার কত কথা তিনি এইভাবে মনে রেখেছেন! কোথাও কোনও ভুল তো নেইই, বরং আমার বিষয়ে কত সামান্য কথাও কী গভীর স্নেহবশে স্মরণ করেছেন দেখে আমি অবাক। তাঁর দীর্ঘকালীন সাংঘাতিক শারীরিক জড়ত্ব নিয়েও এতটা লিখলেন কী করে! ভারতের পর্যটন ক্ষেত্রে 'ভ্রমণ' পত্রিকা নিয়ে আমার ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে উচ্ছ্বসিত কী যেন লিখেছিলেন, শুধু তারই একটা ছোট্ট ভুল উল্লেখ করলাম। আমাকে ফোনে রেখে স্নেহাশিস জানালেন, স্যার ওটা শুধরে দিচ্ছেন।

১৬

আমার প্রথম উপন্যাস 'বিষাদগাথা'র দুটো প্রচ্ছদ করেছিলাম। সম্ভবত দক্ষিণ কলকাতায় সুজয় সোমের বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার দিন আমাদের বাড়িতে দেড়ঘণ্টা আগে এসে আমার নতুন দুয়েকটা পেইন্টিং দেখার কথা হয়েছিল, তারপর এখান থেকেই আমি ও শঙ্খবাবু একসঙ্গে যাব সুজয়ের বিয়েতে, নিমন্ত্রণপত্র ছাড়াও সুজয়ের পুনঃ পুনঃ ফোনে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বলেই এই পরিকল্পনা ছিল আমাদের। আমারই করা। সেই সুযোগে 'বিষাদগাথা'র জন্য যে দুটো প্রচ্ছদ করছিলাম সেই দুটো শঙ্খবাবুকে দেখাই। দুটো দু'হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দেখে একটা বেছে দিলেন।

এর কিছু দিন আগেই কোথায় যেন যাবার আগে 'বিষাদগাথা'র একটা

কম্পিউটার প্রিন্ট শঙ্খবাবুকে পাঠিয়েছিলাম, যদি পড়বার সময় পান।

কলকাতায় ফিরেই শুনলাম শঙ্খবাবু ফোন করেছিলেন। তখনই ফোন করতেই বললেন, ''বিষাদগাথা' পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। সেটা বলবার জন্যই ফোন করেছিলাম। উপন্যাসে অনেক বাক্যই দেখলাম বেশ দীর্ঘ। এ কি ইচ্ছে করেই করেছেন?''

আমার উত্তর শোনার পর আবার বললেন, ''বসিয়ে কবর দেওয়ার কথা লিখেছেন, এমন প্রথা কি বাংলার কোথাও, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, না কি এ আপনার মনগড়া?''

''না, না। বৈষ্ণবদের একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে এই প্রথা।''

এরকম আরও কিছু কথা হবার পর বললেন, ''আপনি যে এরকম একটা উপন্যাস লিখবেন কখনো ভেবেছিলেন!''

বই বেরবার পর মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করতেন ''বিষাদগাথা' নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি?''

আনন্দবাজারে দেবেশ রায় আলোচনা করেছেন জানালে বললেন, ''ওটা পড়েছি। আর কেউ কিছু লেখেননি?''

এরও বেশ কয়েক বছর পর 'জিপসি রাত' উপন্যাস পড়েও ফোন করেছিলেন। এই উপন্যাসের এক জায়গায় একটি চরিত্রের মুখে শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়ার কথা থাকায়, বইটা তাঁকে পাঠানোর পর তাঁর এই প্রথম ফোন আমি কিছুটা সংকোচের সঙ্গেই ধরেছিলাম। সেটি একেবারেই উল্লেখ না করে বললেন, ''বিষাদগাথা'র পরেও এরকম একটা উপন্যাস লিখলেন কী করে! 'অপ্রতিষ্ঠিত স্বরে বললেন', আগে কোথাও পড়িনি। চিরগতিময় জীবনসমুদ্রে পাথরের মতো স্থবির— ভালো লাগল।'' ভাষা ব্যবহারের এরকম আরও কয়েকটা খুঁটিনাটি দিক উল্লেখ করলেন।

'বিষাদগাথা'র নাম আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র প্রভাবেই হয়তো, 'বালিসোনার উপকথা', তা নিয়ে আমার দ্বিধা শুনে শঙ্খবাবু বললেন, ''বিষাদগাথা-ই তো ঠিক আছে।''

আবার, 'জিপসি রাত' নামটা শঙ্খবাবুর ভালো লাগলেও, জিপসি রাত ও নীল শালুক-এর মধ্যে দেবেশ রায়ের পছন্দ ছিল 'নীল শালুক' শুনে শঙ্খবাবু বললেন, ''দেবেশ যখন বলছে আরেকবার দেখে জানাব।'' দুদিন পর ফোনেই জানালেন, ''জিপসি রাত' মনে হয় বেশি উপযুক্ত।''

এভাবেই সহজে স্বভাবশে কতজনকে যে তিনি উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন তার সীমা বা সংখ্যা জানা সহজ নয়। ৩৫ বছর আগে তাঁর উপদেশে ও উৎসাহেই আমার প্রথম গল্প সংকলন 'নিমফুলের মধু'র আত্মপ্রকাশ।

১৭

আমাদের যুগের এক বিস্ময়ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘোষ আমার জীবনে যা সেই স্মৃতিচারণে আমার নিজের কথা বড় বেশি এসে যাবার শংকা থেকে শেষ পর্যন্ত কতটুকু লিখতে পেরেছি জানি না। তাঁকে দীর্ঘদিন এমন কাছ থেকে নানা প্রয়োজনে, প্রসঙ্গে পেয়েছি, তাঁর সুদীর্ঘ স্নেহময় সান্নিধ্যের স্মৃতি শুধুই আমার অসীম পাওয়ায় পূর্ণ। সেই স্মৃতিকথা তাই যতই বলবার চেষ্টা করি, সবই তো শুধু নিজের কথাই হয়ে যায়। আমার এলোমেলো দুয়েকটি চর্চা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি তাঁর নিজের কথায় শুনে নিলে আমার সেই দোষ কিছুটা কমে কি না জানি না।

এই যেমন, একটা:

কোথায় পায় টাকা

বিকেলে অলোকের সঙ্গে কথা বলছি ঘরে বসে, হঠাৎ বেজে উঠল ঘন্টি। দরজা খুলে দেখি সুনীল। বাঃ, এ তো ভালো হলো, দুয়ের চেয়ে তিনে শুনেছি আড্ডা জমে ভালো। কিন্তু লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেই একটা ভয়ও ঢুকল মনে। জমবে, না কি ভাঙবে? সুনীল-অলোকের মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কি ঠিক হবে? কোনো অপ্রিয়তা হবে না তো?

ভয়ের কারণটা হলো, কয়েকদিন আগেই 'কবিতা-পরিচয়' নামের এক পত্রিকায় ওদের বেশ দ্বৈরথ ঘটে গেছে। সুনীলের লেখা কোনো-একটি কবিতাবিচার পড়ে অলোক তার আদ্যন্ত বিরোধিতা করেছে, ওই লেখাকে তার মনে হয়েছে নিতান্তই 'সপ্রতিভ' এবং 'অগভীর', আর এই 'মৃদু ভর্ৎসনা'কে সবিনয়ে 'শিরোধার্য' করে নিয়ে সুনীল লিখেছেন তার এক জোরালো এবং স্মরণীয় উত্তর। ঘটনাচক্রে, যে-কবিতাটি নিয়ে এই বিসংবাদ, সেটি ছিল আবার আমারই লেখা।

এখন কী হবে? দুজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে দুজন? আড়ে

আড়ে কথা হবে? না, হলো না তেমন কিছু। দেখা হতেই অলোক সহাস্যে বলে: 'পড়েছি আপনার জবাব।' সুনীলের ঠোঁটে সামান্য একটু লাজুক হাসি: 'ইচ্ছে করলে আপনিও আবার লিখবেন।' তার পর শুরু হয় স্বাভাবিক গল্পগুজব। কবিতা কাকে বলে, কীভাবে পড়া উচিত কোনো কবিতা, এ নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির মানুষ এই দুজন সমকালীন কবি, কিন্তু তাতে কি বন্ধুত্বের কোনো বাধা হয়? হওয়া ঠিক? হয় না যে সেটা, তা তো দেখাই গেল এখানে। আর, তারই একটা প্রকাশ্য রূপ তখন ফুটে উঠছে সেই পত্রিকাটিকে ঘিরে, 'কবিতা' আর 'পরিচয়' নামদুটিকে জড়িয়ে যে-পত্রিকার নাম হয়েছে 'কবিতা-পরিচয়', যে-পত্রিকায় একই কবিতাকে ভিন্ন ভাবে পড়ছেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। জমে উঠেছে, একই সঙ্গে, কবিতা পড়ার আর বন্ধুজনদের মধ্যে তর্কবিতর্কের স্বাদু এক পরিবেশ।

আর এসব ঘটিয়ে তুলছে তখন অমলিন এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের পড়াশোনা করতে করতেই তার নেশা ধরে গেছে একটা কোনো পত্রিকার ভাবনায়, যা হয়ে উঠবে 'কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন'। খুবই এর দরকার বলে মনে হচ্ছিল তার, কেননা কবিতাকে যে কেবল কবিতা হিসেবেই পড়া যায়, পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় বা আলোড়িত হওয়া যায়, তার সৃষ্টিসূত্রের কথা ভেবে উত্তেজিত হওয়া যায়, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য পড়ে তা যেন আর বোঝাই যায় না। কোনো কি পথ তৈরি হতে পারে না সে-বোধের দিকে? এ-রকম এক ভাবনা নিয়ে তরুণ ওই ছাত্র তার উদ্যমে আর উৎসাহে তখন গড়ে তুলছে সমভাবুকদের এক দল, যে-দলে প্রায় সকলেই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

সফলও হলো তার স্বপ্ন। বড়োমাপের কাগজের ষোলো পৃষ্ঠা, নিরাভরণ ঘিয়ে রঙের মলাটে শাদাসিধে হরফে নামটা শুধু ছাপা, ভেতরে পাঁচটি মাত্র কবিতার আলোচনা। এক গরমের দুপুরে সেই পত্রিকাটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আদর হলো তার, চিঠি বা প্রশ্রয় বা তর্ক নিয়ে উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে বা অম্লান দত্তের মতো মানুষজনেরা। সফলতায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই যুবক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চোখে আর ঘুম নেই, পায়ে আর বিরাম নেই, নতুন নতুন ভাবনার আর ক্ষান্তি নেই।

কিন্তু সফলতা, স্বভাবতই, অনেক অহেতুক সংশয় বিদ্বেষ আক্রমণও সঙ্গে নিয়ে আসে। দুটো সংখ্যা বেরোতে-না-বেরোতেই, বিষ্ণু দে আর সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা থাকা সত্ত্বেও, কথা চলতে থাকে এর প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ-বিরোধিতার মতলব নিয়ে। আবার সেই একই সঙ্গে, তিনটে সংখ্যা গড়িয়ে গেলেও কেন সুধীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া যায় না, এর ভেতরকার নিহিত গূঢ় অভিসন্ধিটা কী হতে পারে, এই নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। পত্রিকার ক্ষীণতনু সম্পাদকীয়তে একথা শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো যে 'আশা করি কোনো পাঠক এতে সুধীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের উদাসীনতা অনুমান করবেন না।' মন্তব্যটি ছাপবার আগেই অবশ্য দপ্তরে এসে গিয়েছে তাঁর 'নৌকাডুবি' কবিতাটি নিয়ে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘ রচনা।

পর-পর সুধীন্দ্রনাথই যদি দেখা দিতে থাকেন— আর হয়ে উঠলও সেটা— তবে তো আরেক বিপদ। 'হিটলারের সুহৃদ স্টালিন' লিখেছিলেন যে-সুধীন্দ্রনাথ, স্পষ্টতই মার্কসবাদবিরোধী যে সুধীন্দ্রনাথ, যাঁকে নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু অরুণকুমার সরকার বিনয় মজুমদারের মতো মানুষেরা, তাঁর এই অতিপ্রাধান্য কি বুঝিয়ে দেয় না যে এর মধ্যে একটা কমিউনিস্ট-বিরোধী চক্রান্ত আছে, আছে সি আই এ-র কালো হাত?

যাদবপুরে একই ঘরে আমাকে বসতে হয় আমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর নাম। কলেজীয় ছাত্রজীবনের সূচনা থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার আর অলোকের ওপর দীর্ঘকালীন এক স্নেহ আছে তাঁর। একদিন সেই দেবীবাবুর টেবিলের উলটোদিকে বসা জিজ্ঞাসু এক ছাত্রকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন 'কবিতা-পরিচয়'-এর ক্ষতিকারক দিকগুলি, বোঝাচ্ছিলেন এর সি আই এ দূষণ তত্ত্ব।

পাশের টেবিল থেকে মাস্টারমশাইয়ের দিকে বিহ্বল তাকিয়ে থাকি আমি। ছেলেটি উঠে যাওয়ার পর বিহ্বলতর স্বরে জিজ্ঞেস করি: 'এ কি আপনি সত্যি বলে ভাবেন?' শান্তভাবে উনি উঠে আসেন আমার টেবিলের সামনে। বলেন: 'দেখো, অলোককে আর তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি তা তো জানো। আমি বলছি না যে তোমরা জেনেশুনে ও-পত্রিকার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে

গেছ। কিন্তু তোমাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছে অনেকে। এ-সংস্রব তোমাদের ঠিক হচ্ছে না। এটা তো একেবারেই সি আই এ-র ব্যাপার।'

'কীভাবে বোঝা যায় তা?'

'বোঝা যাবে না কেন? ভেবে দেখো না, কোথায় পায় এরা এত টাকা? কীভাবে চলে এ-রকম পত্রিকা? অমরেন্দ্র তো ছেলেমানুষ। এর পেছনে দেখছ না আইয়ুব বুদ্ধদেব অম্লান দত্ত? তা ছাড়া, সমালোচনার কোন্ রীতির প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এখানে? দাও তোমার খাতাটা— নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিই।'

সত্যি সত্যি খাতা টেনে নিয়ে দাগ কেটে কেটে তিনি বোঝাতে লাগলেন আমাকে, কীভাবে সোশ্যালিস্ট রিয়্যালিজমের বিপক্ষতা করবার জন্য দেখা দিয়েছে নিউ ক্রিটিসিজম, নিউ ক্রিটিকদের উসকে দিয়ে কীভাবে সোভিয়েতের উলটোদিকে কাজ করছে আমেরিকা, কীভাবে সেই সূত্র ধরে কলকাতায় তৈরি হয়েছে সেন্টার ফর কালচারাল ফ্রিডম, আর কীভাবে আইয়ুব ইত্যাদির সঙ্গে গড়ে উঠেছে সেই সেন্টারের একাত্মতা। সেই আইয়ুবদের নিয়ে সেই নিউ ক্রিটিসিজমের ধাঁচে গড়ে উঠছে এই পত্রিকা। কাজেই, 'কবিতা-পরিচয়' যে সি আই এ প্রণোদিত, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না কিছু। 'বুঝতে পারছ না, টাকাটা আসছে কোত্থেকে?— কিছু বলবে তুমি?

অল্প একটু চুপ থেকে মাস্টারমশাইকে বলি: 'না, বেশি কিছু নয়। বলব শুধু টাকার কথাটা। এই ছেলেটি বাড়ির থেকে যে হাতখরচটুকু পায়, সেটুকু জমিয়ে জমিয়ে, অনেকসময়ে না-খেয়ে, কখনো কখনো এর-ওর বাড়িতে রাত কাটিয়ে, কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে, নিরভিযোগ নিরভিমানভাবে সামান্য এই কাগজখানি যে করে যাচ্ছে, সেটুকু আমি বলতে পারি। কেননা, সেসবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে আমার, আমারও বাড়িতে সে থেকেছে কখনো কখনো। কাগজখানা করতে টাকাও যে খুব বেশি একটা লাগছে তা নয়, আর আলোচনারও তো কোনো নির্দিষ্ট একটা ছাঁচ নেই, লেখা ছাপা হয় অনেকরকমেরই।'

মাস্টারমশাই আবারও বললেন: 'বললামই তো আমি। ভিতরকার ব্যাপারটা তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না।' বলে, চলে গেলেন ক্লাসে।

'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' — শঙ্খ ঘোষ (তৃতীয় শোভন সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৮)

১৮

''অনেক সময় না-খেয়ে, কখনো কখনো এর-ওর বাড়ি রাত কাটিয়ে'' 'কবিতা-পরিচয়' করে যাওয়ার কথা শঙ্খবাবুর এই লেখাটায় না পড়লে আমার মনেই পড়ত না। ''আমারও বাড়িতে সে থেকেছে কখনো কখনো'' পড়ে মনে পড়ে গেল, সারারাত তাঁর মুখোমুখি বসে শুধু কথা বলে আর তাঁর পালিশ করা সেগুনকাঠের মতো উজ্জ্বল যত বাক্য শুনে কত রাত ভোর হয়ে গেছে। একবার তো বোধহয় রাত বারোটাতেও খেতে যাবার কোনও লক্ষণই নেই দেখে প্রতিমাদি বসবার জায়গায়ই দুজনের সামনের নীচু টেবিলের কিছু কাগজপত্র সরিয়ে সেখানেই দু-থালা খিচুড়ি রেখে ঘুমোতে চলে গেলেন। ভোরবেলা প্রতিমাদি এসে দুজনেরই সেই খিচুড়ি খাওয়া হাত শুকিয়ে খড়খড়ে দেখে বললেন, ''এখনও শুতেই যাওনি তোমরা?''

মনে পড়ল একদিন সারাবেলা এভাবেই কথায় ভেসে গিয়ে সন্ধেবেলা হঠাৎ খেয়াল হল, দুপুরেই প্রেসে 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য কাগজ পৌঁছে দেবার কথা ছিল। পকেট হাৎড়ে টাকা না পেয়ে শঙ্খবাবুকেই বললাম, ''আমাকে পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পারেন? 'কবিতা-পরিচয়'-এর কাগজ কেনার কথা ছিল আজ।''

শঙ্খবাবু প্রতিমাদিকে ডেকে খুব শান্তভাবে বললেন, ''অমরেন্দ্রকে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারবে?''

প্রতিমাদি দশ টাকার নতুন পাঁচটি নোট এনে আমাকে দিয়ে বললেন, ''এই টাকাটা শনিবার রেশন তোলার জন্য রাখা ছিল।''

''আমি তার আগেই আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব।''

শঙ্খবাবুর লেখায় ''বলব শুধু টাকার কথাটা'' পড়ে কথাটা আমার মনে পড়ে গেল।

এভাবে পঞ্চান্ন বছরের সব কথা মনে পড়লে এই ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতিকথাও হয়তো শত পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাবে।